প্রকাশক :—
আব্দুর রশিদ
রতুয়া মেইন রোড
রতুয়া, মালদহ।

প্রকাশ কাল :—২৫শে বৈশাখ ১৩৫৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ব্লক শিল্পী :- গ্রন্থকার

মুদ্রণে :—হামেদিয়া প্রেস—রতুয়া, মালদহ

প্রাপ্তিস্থান :—
কষ্টিপাথর সাহিত্য সংসদ
বাহারাল, মালদহ।
ও
এ, রশিদ
রতুয়া, মালদহ।

লেখকের অন্যান্য বই
স্বপ্নঝরে (কাব্যগ্রন্থ)
জীবন যেখানে „ প্রস্তুতির পথে

ভূমিকা

কবি এম ডি. ইউনুস আলি বয়সে তরুণ হলেও কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বহু কবিতা নানা পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সাতাশটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ।

কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় তাদের মধ্যে একটি মাত্র মূল সুর ধ্বনিত। তা হল আমাদের দেশের বর্তমান কালের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ। তাঁর ঘৃণা কতখানি তীব্র তার কিছু পরিচয় তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে ছড়ানো নানা মন্তব্যে ভাল প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দেশ তাঁর নয়নে 'চিড়িয়াখানা'; এখানে 'নিশাচরের আবির্ভাব' ঘটেছে; 'বাস্তবের ঘুঘুডাঙায়' শুধু 'ঘুঘুরা ডেকে যায়।'। তাই জীবনের সৌন্দর্যের 'পাপড়ি শুকিয়ে গেছে বৈশাখী সূর্য্যের প্রখর বর্বরতায়'।

কবি নিজেই বলেছেন তিনি নজরুল ও সুকান্তের 'পথ চলার চালে দীক্ষিত'। কিন্তু নজরুল ত শুধু বিদ্রোহের বাণী শোনান নি, তিনি প্রীতি ও ভক্তির বাণীও শুনিয়েছেন। কবি সুকান্ত অকালে ঝরে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ আয়ু পেলে সম্ভবত তাঁর কাব্যে ভিন্ন সুরের আবির্ভাব হত। আমি আশা করব কবি ইউনুস আলির মনেও নূতন সুরের অনুপ্রবেশ ঘটবে। তার আগমনীর পায়ের ধ্বনি তাঁর বাণীতেই এখনি তা স্পষ্ট শোনা যায়। তিনি বলছেন, সেই দিনের অপেক্ষায় তিনি বসে আছেন যেদিন 'ধরণীর দুর্বাদল ঝলমল' হবে।

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১ বালিগঞ্জ টেরাস,
কলিকাতা-২৯

নিবেদন

ভারতের মাটিতে এটি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। দেশ-বিদেশের পাঠক/পাঠিকার কাছ হ'তে ভুরি ভুরি মতামত বা প্রশংসাপত্র পাওয়ার মোটেই উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য এই যে, আমরা ভারতবাসী, ভারতের নাগরিক। প্রশ্ন ওঠে—শুধু নাগরিক হলেই কি তার কর্তব্য শেষ? না, এই মহান ভারতের ভার যেমন রাষ্ট্রপতি বা প্রধান মন্ত্রীর কাঁধে অর্পণ করা হয়, তেমনি দায়-দায়িত্ব রয়েছে দেশের বিভিন্ন উঁচু নীচু দেশ কাণ্ডারী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি নাগরিকের কাঁধেও। এটি আমার মনের কথা কিংবা জ্ঞান দেওয়া মোটেই নয়—স্রষ্টার সৃষ্টিকে যেমন যুগে যুগে, কালে কালে বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন তুলি নানান ঢঙে নানান রঙে রূপায়িত করে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দেশের কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতিরও দায়-দায়িত্ব —দেশ-বিদেশের কোথায় কি ঘটেছে ঘটে যাচ্ছে—এসবকেও বিভিন্ন কাগজের পৃষ্ঠায় তুলে ধরা কর্তব্য। কেননা, এঁরাও তো সবাই শিল্পী।

তাই বিশ্বের কথা বাদ দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র ভারতের মাটিতে কখন কি ভাবে কি কি ঘটে গেছে যাচ্ছে, তারই কিছু কিছু নমুমার নিদর্শন স্বরূপ আমার এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভারতের মাটিতে'।

মাত্র ২৭ খানা কবিতা নিয়ে গ্রন্থখানির প্রকাশ। আরো বেশ কিছু কবিতা সংযোজনের সাধ থাকলেও অর্থাভাবে সাধ্য হলনা আমার। আমার কবিতা দেশের দু'একজন বুঝুক আর বাঁকি সবের বোঝার প্রয়োজন নেই এ আমি চাইনা কোন দিন। তাই দুর্বোধ্য কবিতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে কাব্যের প্রায় সব কবিতাই সহজ ও সরল শব্দ সংযোজনায় তুলি মারার চেষ্টা করেছি। এখন মূল্যায়নের ভার সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার ওপর। যদি সত্যি সত্যিই আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর ভাবধারা আপনাদের কিছুটা আনন্দের আহার হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই জানবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা ইতিপূর্বে ভারতের কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও দেশ ও জাতির স্বার্থে সেসব লেখনীকে একত্রিত করে প্রকাশ

করা হল। মাননীয় ডঃ হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কাব্যগ্রন্থ খানির ভূমিকা লিখে ধন্য করেছেন এবং প্রকাশের ব্যাপারে বন্ধু এ, রশিদ প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গ্রন্থখানি যে আপনাদের হাতে তুলে দিলেন এর জন্য আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আসুন, আমরা ভারতের নাগরিক—ভারতবর্ষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আপনার-আমার-সবার দেশ। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার মূলচ্ছেদ করে দিকে দিকে গড়ে তুলি আমাদের মহান মাতৃভূমি, সোনার ভারত।

গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন—

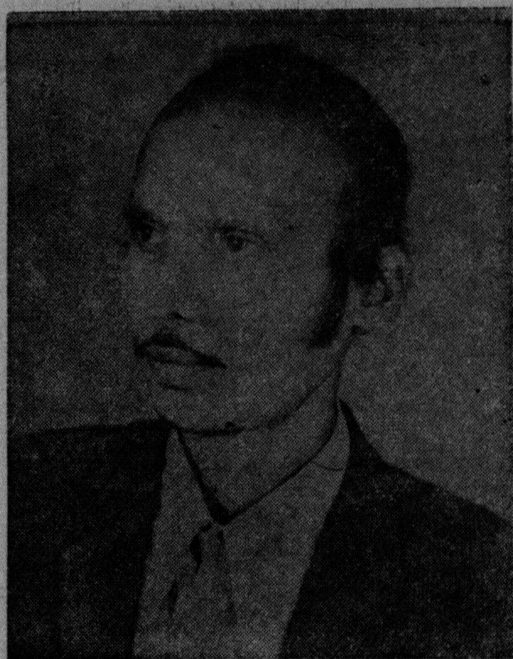
কবি এম ডি, ইউনুস আলির 'ভারতের মাটিতে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। এটি কবির দ্বিতীয় কবিতার বই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নঝরে'-র কীর্তির জন্য কলিকাতা আলোর যাত্রী সাহিত্য সংসদ কবিকে 'কাব্যসুধানিধি' উপাধিতে ভূষিত করে। তা'ছাড়া 'সুকান্ত স্মৃতি' পদক পুরস্কারও পান এই কাব্যগ্রন্থটির জন্য।

যাকৃগে, এই 'ভারতের মাটিতে' ভারত বর্ষের সমগ্র জাতির মানব জীবনে অতীতে কি ঘটেছে তার কিছু, বর্ত্তমানে কি ঘটছে এবং আগামী দিনে কি ঘটতে পারে তার—ভাবগুলিকে কবি নিজের দৃষ্টি ভঙ্গীতে সুন্দরভাবে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে চিত্রিত করেছেন। কবিতাগুলি সারা বিশ্বের সুহৃদ পাঠক/পাঠিকার মনে যদি রেখাপাত করে তাহ'লেই কবির শ্রম সার্থক হবে। বইটির ব্যাপক প্রচার ও কবির সুস্থ জীবন কামনা করি।

ইতি—

এ, রশিদ

রতুয়া; মালদহ।



সূচীপত্র

—:*:—

উৎসর্গ

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

ও

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের

স্মৃতির প্রতি —

* * * *

লহ বীর দুই ভারত-সন্তান

ভারত-জনের ব্যথিত সুর—

দূর হোক সব ভারত শ্বাপদ

শান্তি নীড় হোক সুমধুর !

যে ব্যথা লয়ে গিয়েছো তোমরা

ঝরে তা আজো মন-আঁখিতে—

দুইয়েরে স্মরণে দিনুতো চরণে

আমারি 'ভারতের মাটিতে'।

— গ্রন্থকার

ভারতের মাটিতে

তুমি কি শিখেছো ল্যাং মারামারি ?
কিংবা কিছুটা জাদু····কিছুটা ভেল্‌কি ?
তাহলে এখনি দাঁড়িয়ে যাও
নিবিড় নির্বিঘ্নে কোনো এক সারিতে।
পাড়িতেই তাকিয়ে দ্যাখো
ভারতের মাটিতে লেগেছে রঙ
লেগেছে নিত্য নূতন মেধার লড়াই—
নবীন-প্রবীণ প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ে
ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে যায় খেলার রকম।
চমৎকার :
দ্যাখো দ্যাখো, কেমন ছুটোছুটি
কেউবা ডিগ্‌বাজি কেউবা চিংপটাং
কেউবা প্রাণপণে সামনে সটান্
কেউবা মাটিতেই মাথার উপর ভর করে
পা-দুটো উর্দ্ধাকাশে খাড়ো—
কী অপূর্ব কায়দায় অপূর্ব ভঙ্গিমায়
করজোড়ে জানায় প্রণাম।
এই তো জমেছে খেলা, এবেলা-ওবেলা
কিছু চালাক-চতুর খেলোয়াড়
কেমন নিত্য নূতন রঙে-রঙ চটিয়ে
দেখায় সবুজ সংকেত—
টিকিট পেয়েছো, টিকিট ?
চিড়িয়াখানার হে ? সে কি!
এখনি করে ফেলো, ঢুকে পড়ো ভেতরে!
ঐ দ্যাখো সামনের খাঁচাতেই খাঁচাবন্দী
কত শিক্ষিত বুভুক্ষ বনমানুষ
এম্‌নি আরো কত ভারতীয় ব.ঘ

মানুষ দেখলেই ওরা ছুটে আসে সামনে
বিহ্বল দৃষ্টিতে বলে উঠে
'কী সংবাদ—ভ্যাকেন্সি ? ভ্যাকেন্সি ??'
আহাঃ নীরব দর্শকের নীরবতায়—ওরা
মুখ লুকোয় বুকে, ঢলে পড়ে খাঁচায়।
তারপর আরো হাঁটো—
দেখবে কত ভারতীয় ভাল্লুক
পেটীবন্ধ মুখে জ্বরে জর্জ্জরিত—কত প্রতিবাদ
অথচ তবুও নেই ডাক্তার
নেই ঔষধ, আছে ছ'দাগ লাল-সাদা জল।
কি বল্লে ? আজব চিড়িয়াখানা ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ দ্যাখো না
তোমার-আমার মত, কত শত বানর
বসে বসে ভাগা গোণে—ফ্যাল ফ্যাল চাহনি
প্রতিবাদ নেই মুখে, তবুও বেশ আছে সুখে
প্রভুর প্রাত্যহিক হুকুম তামিলেই
ক্ষুধার আমেজেই বাজায় ডুগ্‌ডুগি
পুণ হাঁটো—
এম্‌নি আরো কত যুগ্‌যুগি জানোয়ার
দেখতে পাবে দেশী খাঁচায়-মাচায়
দেখবে এসো, এসো আমাদের
এই ভারতের আদিম চিড়িয়াখানায় !

ক্ষুধার্ত বাজ

মানচিত্রে নজর দাও—
দেখ ভারতবর্ষ প্রায়ই মৌচাকের মতো।
এ মৌচাকে অনেক মধু, অনেক লালসা
অনেক বিদেশী ধূর্তবাজ বার বার দিয়েছে হানা…
এ প্রহর কেটেছে অনেক, অনেক দিয়েছি রক্ত
অনেক রুখেছি, অনেক ভেঙেছি বিষদাঁত।
অথচ আজ আমরাই ক্ষুধার্ত—আমরাই ধূর্ত
এখন আমাদেরি হাড়-মাস নানা রোগে আক্রান্ত
তাই উদভ্রান্ত কাঙালের দল
ভুলে গেছি বিদেশী-উদেশী
এখন ভারতের মধুচাকে—আমরাই
অনন্ত উদভ্রান্ত মাতাল বেসামাল।
তাই আলো-আঁধারের বুক চিরে চিরে
লেগেছে রঙ…ঐ দ্যাখ চাকের চার পাশে
কত নির্লজ্জ ক্ষুধার্ত বাজের আনাগোনা…
অথচ নীরেট মৌমাছির দল
ভারতের ভাগ্যাকাশে ভাগ্য গোণে
এক……………দুই……………তিন!
হায় ভারত! হায় ভারতের ভাগ্য বিধাতা!
জানিনা কবে কোন্ মুহূর্তে
আমাদেরি বেহদ্দ ক্ষুধার্ত ঠোঁটে
ভারতের বৈচিত্র্য মধুচাক
হয়ে যাবে—ভাগে ভাগ॥

আশাবাই

সূর্য্য ডোবে   ভূর্য্য বাজে
বাজনদারের   বাদ্য বাজে
ধুক্‌ড়ি লয়ে ধূম্র হেরি পরিক্ষীণ—
পরমায়ুর   প্রান্ত দেহে
গৃধ্নু-গৃধ্নু আসছে ধেয়ে
উড়ছে উড়ুক ফুরুক্‌বীণে মরণ চিন।
বিষ-বারুদের বৃদ্ধ বোমা
বোমা বোমা বৃদ্ধ বোমা
কমা কমা গৃধ্নু কমা সাগর পার—
এপার ওপার শ্মশান বানা
ভালুক বানা বানর বানা
ধিন্‌তা নানা, বাহ্‌রে ভাইয়া নাচনদার!
শাসক-শোষক তুঙ্গে তূর্য্য
মোদের ফাটে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধ
ঊর্দ্ধশায়ী কাঁদে মোদের লক্ষ প্রাণ—
ঊর্মিলোকের উদো মানব
সেবিতে সব দৈত্য-দানব
ইন্দ্রতূল তুল্যসম তুলে জয়গান!
হায় আমাদের ভারত ভূমে
যমকে মানে যমকে চুমে
দম্‌কে ভাবে মনকে আশাবাই—
উন্মেষে কই উঠরে উদো
যমকে কোট করবে জুদো
খুনকে খেয়ে ধুন্‌কে ধুনে যাই!
বিষ-বারুদের আমরা মানব
বিষের হাতে রুখি দানব
বিশ্ব-ভূমে মোরাই শান্ত সন্ধানী—
মোদের ঘরে মোদের করে
জন্ম বছর থরে থরে
পলে পলে মারছে উঁকি খুন্‌-খুনী।

মশাল হাতে

আকাশের গায়ে চোখ রাখি
প্রাণ উড়ে চলে ক্লান্ত পাখির ডানায়—
নীল হতে নীল গগনের গায়ে
দৃষ্টি ফেরাই—আকাশ বয়ে আনে
বারুদের ঘ্রাণ। ওদিকে দৃষ্টির প্রতিধ্বনি
রঙ লাগায় কোন্ রণাঙ্গনে—
ঝরে পড়ে একে একে পাখির পালক,
এ তো পালক নয়, যেন ধরণীর 'পরে
তীর বেঁধা পাখির অবশ-বিবশ দেহ!
এমনি করেই ঝরে যায় সহস্র জীবনের পাপড়ি
এমনি করেই বেড়ে যায় মরীচিকায় হাহাকার
এমনি করেই কত শত ক্যাক্‌টাস
জানায় তীব্র প্রতিবাদ—বৃষ্টি আর বৃষ্টি!

তবুও তুমি আমি বেঁচে আছি
আছি এক তীব্রতার জ্বালা সয়ে বুকে,
বিক্ষুব্ধ প্রাণ জানি কলরোল....চঞ্চল
ধরণীর দুর্বাদল হবে—হবেই ঝলমল,
তাই বসে আছি সেদিনের
তীব্র মশাল হাতে।

অপেক্ষায়

তোমরা বলবে, আশার আলোকে
নিশাচর চরে বেড়ায় পেটের যন্ত্রণায়,
নিঃসীম আকাশ পথ দেখায়
প্রহরী সেজে—চাঁদ, চাঁদের আলো
ঘোষণা করে ভোরের বিহঙ্গ
আর একটি সকাল।

ভোরের সঙ্কেত ধ্বনিত হলেই
নিশাচর চাঁদ, চাঁদের আলো
রোজ রোজ রচনা করে
এক একটি ইতিহাস।

তারপর একে একে স্বপ্নরা
স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়
পেচাঁর পরিপক্ক পালকের নীচে
তোমরা বলবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম,
তাই বলো : এখন ভারতের মাটিতেই
এইসব নিশাচরের প্রাদুর্ভাব।

তবুও আকাশ-মাটিতে ফাঁদ পাতি ভায়া
কখন ধরা পড়ে কয়েকটি নিশাচর···
এদিকে চতুর চাঁদ, চাঁদের আলো
আলোকিত করে আমার পাতানো ফাঁদ।
এখন একটি কালো মেঘের অপেক্ষায় আছি
কখন অন্ধকার চাদর হয়ে ঢাকা দেবে
জ্যোৎস্নালোকের যাওয়া আসার পথ,
আমি জানি—আঁধার নামলেই
আটকা পড়বেই কিছুটা নিশাচর····
আর প্রভাতেই ওদেরি রক্তে রচনা হবে
আর এক নোতুন ইতিহাস।

চাবুক

কোন এক আদ্যিকালে আধবুড়ো গুরু মশাই-এর করকমলে
আবির্ভূত হয়েছিলে, কত খচ্চর পিটে পিটে অশ্বদলে····
তখন খচ্চর আর অশ্বতেও মিতালিটা ছিল গুরু-পাকের
আর গুরুর সম্বন্ধটাও ছিল বড় মিষ্টি-মধুর। তাই
দলে দলে খচ্চর সেজেছিল অশ্ব—বিশ্ব মাঝে নামের তালিকায়।
ক্রমে ঊর্মিলোকের জাগ্রত উদোমানব পেয়েছিল গুরুশিক্ষা
আর জাগ্রত চাবুকের ঘা'য়েই সোজা সেদিনের সহস্র ব্যভিচার
কত উদ্ধত ইংরেজ—উদ্ধত মাথার টুপি রেখেছিল
ভূ-ভারতের ভূমিতে সেলাম ঠুকে নতজানু প্রক্রিয়ায়।
আজ বিদেশী নেই, নেই তাদের উদ্ধত চাবুক
আছে স্বদেশী—আজো আছে সেই ভারত
আরো আছে আদ্যিকালের আধবুড়ো গুরু—পাকের চাবুক।
সময়ে তোমার আমার মতো সহস্র শিষ্য প্রথানুসারে রিং-মাষ্টার
'ভারত সার্কাস' আমাদেরি হাতের নিত্য-নৈমিত্তিক খেলনা
কত সিংহ, হায়না, এই চাবুকেই নতজানু
ভুলেছে ব্যভিচারের বায়না।
তবুও কিছু খচ্চর আজো সময়ের ব্যতিক্রম
বাঁকি মজা এখনো বাঁকি—তাই এসেছে সময়
উন্মোচন করো ভারত সার্কাসের দ্বার
দর্শকরা ভিড় করুক আনন্দে, টিকিট-গেটপাশ নেই
ওরা দেখুক—ওদের ভেতরে আসতে দাও নির্দ্বিধায়!
এইতো জমেছে নবযুগ, নব চেতনার আবিষ্কৃত খেলার রকম
ঐ চেয়ে ত্যাখ—আজো কিছু নবাগত খচ্চরের কাঁধে ঝুলে
কু-কীর্তির রঙীন ঝুলি, দিনান্তের ডায়েরী
রাতে শোষণ-নীতির কল্পনার রঙীন মানচিত্র—ভয় নেই
ভালুক এখনো খাঁচাবন্দী, কালকের চাবুকেই জ্বরে জর্জরিত
এখন পিঠ খুলো খচ্চরদের, আহাঃ মারো কেন!
তুমি যে 'ভারত সার্কাস' রিং-মাষ্টার, বদনাম নিওনা কাঁধে।
আজকের মতো শুধু চাবুকের চিহ্নটা এঁকে দাও ওদের পিঠে।

মনের আকাশে উল্কাপাত

যে পাখি উড়ে গেছে
অনেক দিন আগেই সাগরের উপর দিয়ে—
যে মন কবেই গেছে
তারে ফিরিয়ে আনতে প্রেমের শিকল নিয়ে।
যে পাপড়ি শুকে গেছে
বৈশাখী সূর্য্যের প্রখর বর্বরতার নিঝুম দুপুরে
যে হাওয়া উড়ে গেছে
শ্রাবণের ভাসমান মেঘের নিক্কন নুপুরে···

আজ মনের পাখি, মন, মনের পাপড়ি
মনের শ্রাবণতার রিম্‌ঝিম্‌ ঝরণায়
আমি খুঁজে নেবো আমার মনের বিহঙ্গ.
ত্রিশ বছরের শুকনো পাপড়ির মর্মর ধ্বনিতেই
আমি পেয়ে যাবো, আমার হারানো সবকিছু।

হয়তো তোমরা বলবে, 'নিছক কবির কল্পনা.'
আমি বলবো— না—না—না—
আমার সবকিছুর পাবার মূলেই রয়েছে
আমার মনের আকাশে বিষাক্ত উল্কাপাত।

স্বাধীনতার সুখ

চোখের গভীরে, রাত্রি সেচ দিয়ে যায়
স্বাধীনতার খাল কেটে কেটে
নির্জন নিশুতি অমাবস্যায়।
কিছু স্বার্থান্বেষীর নির্লজ্জতার দহনে
হাতের চুড়ি চুরমার করে
রাত্রি সেজেছে অকাল বৈধব্য।
এখন রিণিকি রিণিকি কঙ্কন বাজেনা
ঝিনিকি ঝিনিকি বোল ওঠেনা
জোনাকি জ্বলেনা নাকের ওপর।
এখন চারিদিক নীরবতার নিবিড়াবদ্ধে
চোখের গভীরে খাই খাই উড়ে যায় কাক শকুন
বাতাসে শ্মশান উথাল-পাথাল।
সামনে বোধ হয় ভূতেরা নৃত্য করে যায়
অন্ধকারে পা ফেলতেই ময়াল, গোখুরার বাঁকানো-দাঁত
বেওকুফ করে দেয় নিমেষেই।
পকেট হাতরাই, শ্লা—শালাইটাও····থাক—
বরং স্বাধীনতা দিবসে, ধূপকাঠির মুখে
ঘষে দিয়ে আমিও বলে উঠবো—
'আল্লা মেঘ দে ! পানি দে !
আলো দে রে তুই !'

পালা বদল—অথচ

নীলাকাশের নীল সমুদ্রে
মেঘেরা কখনো বা ব-দ্বীপ হয়ে উঁকি মারে
কখনো বা সদ্যঃস্নাত করে তোলে
ধরণীর দূর্বাদল ঝলমল শিশির বিন্দু
ক্ষণিকেই উবে যায় উত্তপ্ত সম্রাটের উত্তাপে।
আমি দেখেছি বিন্দুর মাঝেই সিন্ধুর জলতরঙ্গ
যেখানে কোটি কোটি প্রাণ বজ্র নিনাদে ছাড়ে হুংকার
ভেঙে দিতে চায় পুরনো সংবিধান
গড়ে নিতে চায় আর একটি সু-প্রভাত।
অথচ উত্তপ্ত ঔদ্ধত্য এখনো শোষণ করে
রামধনুর সপ্ত রঙ······যেখানে তোমার আমার
আমার তোমার জীবনের সাত রঙ, সাত পাকে বাঁধা!
অথচ আজো কবির কল্পনায় নীহারিকা-ছায়াপথ
পথ চেয়েই আছে বিক্ষুব্ধ তারকারাজি
আজো ছুঁড়ে মারে অভিশাপের মুঠো মুঠো গ্লানি
টান পড়ে কবির কল্পনার মহারজ্জুতে—
কেননা আবার দিকে দিকে নেতা নির্বাচনের পালা!

যূথভ্রষ্ট

নিত্য নূতন নব রঙে নব নৈপুণ্যে
নিরুপম নব কুমার নমস্য তোমরা.
দক্ষতা দংশনে দক্ষিণা দৈহিক দাহনে
দগ্ধ দংশিত দ্বিষ্ট-দেষ্য আমরা !
তোমরা হের ফেরে হরেক হরষে হজমে
হটানো হননে হরদম হানাদার—
আমরা আজু আজন্ম আধমরা আগাছা
আঁধলা আদিম অরণ্যে আদাড় !
তোমরা তোমাদের তুঙ্গ তৃপ্তে তৃষিত
তম্বি তড়পাও তেজীয়ান তেজিষ্ঠ,
আমরা তৃণ তথাবিধ বহুরূপী বেশবিন্যাসে
বেহক বেহদ্দ বেল্লিক পামর পাপিষ্ঠ !
না জানি চূর্ণিত চুয়াড় চিত্তভ্রংশ
চিরন্তন চেতায় চুপ্‌সিত কতকাল—
বহুরূপীর বংশ বাহনে বহিত্র বশানুগ
বোকাটে বহ্নিতে বেওকুফ বংশজ বহাল !!

প্রজাপতি উড়ে চলে

শব্দ সুরভির রূপে-রসে
যে দান আছে স্রষ্টার—মিলিয়ে নিও
একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির সুসজ্জিত পাখনায়
বিন্দু বিন্দু বিচিত্র রঙে রঞ্জিত রূপ-বাহার,
এমনি সুখ মেলেনা, মেলেনা আর—
কবিতার ডানা কেটে গেছে, আজকের
ঠুন্‌কো তুলির ঠুন্‌কো রূপে-রসে !
শব্দ খুঁজে মরে কবিতার যৌবনা ফুল
ফুল খুঁজে কবিতার নিখুঁত প্রেম
প্রেম খুঁজে প্রেমিকের ভালবাসার শাখা—
তাই বুঝি আমার ছোট্ট প্রজাপতি উড়ে চলে
রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের কবিতার ডালে ডালে
প্রজাপতি উড়ে চলে৹

নোঙর

বীভৎস রাতও হিংস্র শ্বাপদের ভয়ে
পালিয়ে যায় সময়ের রজ্জু ধরে—
সূর্য্যও প্রভাতকে কুরে কুরে খায়
প্রভাত হামাগুড়ি দিয়ে পালায়
মাথা কুটে কুটে রাত্রির গভীর শয্যায় !

আমিও বাঁচার বোঁচ্‌কা তাতে দিন-রাত
শব্দ সাগরে নোঙর ফেলে যাই অহরহ....
ক্লান্ত ধীবর খুঁজে পায় শব্দ শূন্যতা,
তাই আজো মানব-মুক্তির শব্দ সমুদ্রে
নোঙর ফেলে চলেছি.......তো.........চলেছি !

বাঁধ না ফাঁদ ?

কেউ যদি জাদু জানো—
পৃথিবীর মাটি কেটে কেটে ঘর বাঁধো
মহাশূন্যতার কোলে, ছলে বলে
সবকিছু টেনে নাও সেখানে,
যেখানে বন্যা এসে কাঁদাবেনা বারবার
ভাসিয়ে দেবেনা তোমার সুখের সংসার !
কেননা, এখানে চারদিক চতুরঙ্গ বাঁধ—
বাঁধ নয়, ফাঁদ—তোমার এখানের বাড়িটা
বাঁধের ভেতরে আছে তো ?
সাবধান ! যে কোন মুহূর্তেই
একটি ইঁদুর প্রমাদ ঘটাতে পারে ।

স্বাধীনতার সাধ

জীবনের মহাশূন্যতার কোলে
বত্রিশতম হাটের হিসেব
এখনো আকাশের অগণিত 'তারা'।
এখনো ফেরেনি সাঁঝের হাটুরে
এখনো জ্বলেনি স্বাধীনতার উনুন
এখনো রুগ্না মায়ের আঁচলে পড়ে টান
ঝরে স্বাধীনতার অশ্রু........শিশুর আর্তনাদ !
হায় স্বাধীন ! হায় পরাধীনতার গ্লানি !
জানিনা আরো কত দিন—সাধহীন
হয়ে হয়ে আমারা গোণে যাবো
স্বাধীনতার জীবনাকাশে অনন্ত তারকা !!

ছায়া

কার যেন সাত মহলার ছায়া পড়েছে
দুঃখ ভরা দুখিরামের আঙিনায়—
ছায়ার শীর্ষদেশ হতে একফালি চাঁদ
উঁকি মেরে ইঙ্গিত করে—'ও তারা বউ
আয় আয় চলে আয়, আর কত নীচে শোবি
এ্যায় দ্যাখ কেমন আমি বসে আছি আকাশে !'
তারা বউ পর্ণনীড় হতে নীর মুছে দেয় ইশারা—
'সরে আয় সরে আয়, ওটা বাবু-বাড়ীর বিষাক্ত ছায়া
গায়ে মাখিসনে, খাজানা নেবে তোর !'
গর্জে উঠে দুখিরামের সঞ্চিত ক্রোধ —
'এটা আমার আঙিনা তারা বউ,
বাবুদের বিষাক্ত ছায়া আমি সরাবই সরাবো !'
দুখিরাম কোমর বাঁধে—ছায়া ক্রমশঃ সরে যায়।

বাস্তবের ঘুঘুডাঙ্গায়

অনেক দূরে এসে গিয়ে
অনেক আশাকে আশার শেলে পুরে
অনেক স্বপ্নকে স্বপ্নের অদৃশ্য কাঁচে
কিংবা কোন এক নির্জন সন্ধ্যায়
জীবন কষ্টিপাথরে বার বার মিলিয়েছি
জীবন ব্যাকুলতার ব্যবধান—পাইনি উত্তর !
বাস্তবের ঘুঘুডাঙ্গায়, ফাঁকা ধূধূ মাঠে
ঘুঘুরা ডেকে যায় ঘুঘু—ঘু ।
সন্ধ্যা নামে, ক্রমে গ্রাম্য কোলাহল থামে
নিস্তব্ধ রজনীর কালো পর্দা ভেদ করে
ভেসে আসে পেঁচাদের ভুক্ ভুক্ শব্দ....
রাত্রি, ঘৃণা-লজ্জায়
মুখ ঢাকে প্রভাতের রাঙা রেশ্‌মি পর্দায়
হোক প্রভাত ! প্রভাত হতেই চোখের চত্বরে
উড়ে যায় কত উচ্ছৃঙ্খল বেহায়া ফড়িং
বদ্ধ খাঁচার ক্ষুধার্ত ময়নাটা
একটা ছোঁ মেরে গিলে খাবে
উপায় নেই গোলাম হোসেন
ওরাও নাকি ঘুঘুডাঙ্গার ঘুঘুরই জাত
ওদেরও ডানা আছে তাই ।
এম্‌নি করে মাস যায়—বছর আসে
আসে বাস্তবের ঘুঘুডাঙ্গায় বেসুরো সুর—
এই সৌখিন সোহাগ বসন্ত বেলায়
ওরা তো ডাকবেই, ডাকো—
তবে ডাকার রকমটা যদি সিদ্ধ তাপস যোগী
কিংবা স্বার্থত্যাগী শব্দ ও সুর হতো
তাহলে তো তুমি আমি সবাই
পীল, রবার্ট—পেরিক্লিস—বাইট, জন—ব্রাউনিং, স্ট্যালিন
কিংবা গ্ল্যাড্‌ষ্টোন-ডিজরেলি হতে পারতাম—
অনায়াসেই ।

ঋতুরাজ্যে—পেঁচার বাসা

ঋতু রাজ্যে কাশফুল, ঘাসফুল ঝরে আপন মনে—
বনে বনে আর্তনাদ— যেন গর্ভিনীর অকাল গর্ভপাত,
নদীখাত আরো গভীর আরো প্রশস্ত, তবুও অহরহ
ডেকে যায় বৈশাখী জীমূতের মতো। হিল্লোলিত
উজান-ভাটির বেসুরো হাওয়ায় প্রতিধ্বনি মুখ লুকোয়
ওপারের ঝাউবনে, চলন্ত পৃথিবীর বুকে নামে ছায়া!
এদিকে কে বা কারা ভূতের নৃত্যে ছন্দ তোলে
চিক্‌চিক্ বালি আর মন্দাকিনীর মরা তরঙ্গে
ম্যায় ভুখাহুঁ! ভুখাহুঁ—ম্যায় ভুখাহুঁ!
অথচ এরই মাঝে জ্যোৎস্না ঢেকে আঁধার নামে
পেঁচাদের আহ্বানে, নিস্তব্ধ পল্লীর বুক চিরে চিরে
ভেসে আসে অমঙ্গলের হুক্ হুক্ বার্তা....
না জানি আবার কার অশুভ ইঙ্গিত!

তাই আজ প্রতিশ্রুত আমি, আমরা
ওদের ডানা ভেঙে উজাড় করবোই ওদের বাসা
কেননা, ঋতুরাজ্যে এখন আমরাই
দিকে দিকে অগণন নির্ভিক সহযাত্রী।

রণতন্ত্র

হৃদয় যেখানে এক হয়ে মিশেনি
মিতালির মনো-মোহনায়—
রক্ত যেখানে মাতাল সেজে
সাগর সাজে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়,
মুখোশ যেখানে মুক্ত হয়ে
দেয়নি বাঁচার মূল-মন্ত্র—
অথচ তোমরা কোন্ মুখে বলো
আমাদের গণতন্ত্র?
প্রাণ যেখানে পুতুল হয়ে
আজো খেলা করে মিথ্যা বেসাতির
শিশুদের শিশ মহলে....
ঠুন্‌কো ভালোবাসা, ক্ষণিকের লেন-দেন
ক্ষণিকেই চুকে যায়
শিশু মনের হাতাহাতি কোলাহলে।
অথচ আমরা আজো ধ্বনি তুলি, 'আমাদের গণতন্ত্র'
আসলে সবকিছু স্থায়ী নিক্তিতে উঠালেই
ওটা শিশু মনের ধুলো খেলার 'রণতন্ত্র'।

ঠিকানা—অধিকার—ভাণ্ডার

নীলাকাশে উড়ন্ত কপোত-কপোতীকে
প্রশ্ন করো—রক্ত ?
বলবে—নির্বোধ, এখানে প্রেম
এখানে অনন্ত অজানার
খুঁজে পাওয়ার ঠিকানা।
গভীর রাতের অসংখ্য তারকার ভীড়ে
প্রশ্ন করো—রক্ত ??
বলবে—মূর্খ, এখানে অসংখ্য জীবন
এখানে জীবন সাধনার শেষাধার
এখানে সাম্যের সকল অধিকার।
একটি খুনীকে পথ চলতেই সহসা
প্রশ্ন করো—জীবন ???
বলবে—নির্বোধ, জীবন মানেই খুন
খুন মানেই খুনীর সহজ সাধনা
এখানে নেই 'প্রেম-প্রীতি-ক্ষমা'।
তাই ভূ-ভারতের মহাশূন্য সীমানায়
কপোত-কপোতীও নেই
নেই আকাশে সাম্য-সাধনার তারকা
আছে শুধু খুনীর খুনাগার—আর
ইন্ধন জোগানোর কুখ্যাত ভাণ্ডার।

দে মা !

আর কত জ্বালা বুকে সয়ে
এই অনন্ত খেলা দেখবি মা !
কত রক্ত-আবিরে রাঙাবি আঁচল ?
এবারে পাষাণ প্রাচীর চুরমার করে
দেশ গড়ার মন্ত্র দে মা ঢেলে—
ওরা সফর করুক লোলুপতার নরকানলে
আমরা ততক্ষণে এগিয়ে যাই
কন্যা-কুমারিকা-হিমাচল
এখন দে মা তোর শান্তির শ্রী আলো
দে মা তোর প্রশস্ত আঁচল ঢেলে !

চোখের গভীরে

চোখের গভীরে আর এক অপূর্ব রাজ্য—
যেখানে সবুজ পৃথিবীর বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে
সবুজ গালিচায় ছড়িয়ে দিয়েছে
চোখের বিন্দুতেই অসংখ্য অম্লান মুক্তো-দানা,
যেখানে নেই আনা-গোনা, কোনো
হিংস্র শ্বাপদ-শৃগালের ভাগাভাগির নিষ্ঠুর বর্বরতা
যেখানে বর্ষাতি বিহঙ্গ অঙ্গ উষ্ণ করে
প্রেমিক-প্রেমিকার শুভ্র সোহাগের ঠোঁটে—
প্রভাত হতেই চোখের বিস্তির্ণাকাশে
অবাধে বিচরণ করে দূরে—আরো দূরে—
যেখানে হিংসা নেই, রক্ত চাটাচাটি নেই
নেই আসনের রদ-বদলের পালা, ঢালা আছে
সাত রাজ্যের সহস্র সোনালী দুপুর।
চলনা ! তুমি আমি, আমি তুমি
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চোখের গভীরে
সবুজ কার্পেট হতে কুড়িয়ে আনি সহস্র জীবনের
সহস্র সুখানন্দের....সহস্র রঙীন মুক্তো-দানা !

মায়ের ছেলে

যে মাটিতে জন্ম নিয়েছো শিশু
সেই মাটিতেই দাঁড়াতে হবে শিরদাঁড়া করে—
দেখ, জনম যেন জখম না হয়
কোনো হায়নার নখাচারে !

তোমার থাবা হিমালয়ের থাবা
চক্ষু তোমার বিস্ফারিত বাজ—
নাসিকা তোমার নায়েগ্রার ধারা
ভাবনা তোমার কাল নয়—আজ !

তুমি কি শিখেছো দাঁড়াতে ?
জিজ্ঞেস করো তোমার পা-দু'টোকে—
ভাবনা তোমার হয়েছে কি শেষ ?
শক্ত করো হাত দু'টোকে !

ওই দ্যাখো ক্ষণে ক্ষণে গুমরে ওঠে
বিদ্রোহী কঙ্কালের শত হাহাকার—
যুগ যুগ তোমারই প্রতীক্ষায় ওরা
সয়ে গেছে দানবের যত অনাচার।

ওই মিছিলেই রয়েছে তোমার
পিতৃ-পিতামহের শত হাহাকার—
জানিয়াও তাহা জাননা কি তুমি ?
নাশো—নাশো, যতসব দুরাচার !

এখনি তোমার ছুটাও ঘোড়া
বিশ্ব দেখুক 'মায়ের সন্তান'—
দিকে দিকে বাজুক জয়-দামামা
নিপাত যাক দেশজ জারজ সন্তান !

যে মাটিতে জন্ম নিয়েছো শিশু
সেই মাটিতেই দাঁড়াতে হবে শিরদাঁড়া করে—
দেখ, জনম যেন জখম না হয়
কোনো হায়নার নখাচারে !!

সেই স্মৃতি

এই আমার গ্রাম—
এইটি আমার দেশ!
যেখানে একদিন হাঁটি হাঁটি পা করে
হেঁটে গেছি অনেক চেনা-অচেনা পথ—
কত ধুলা, কত ফুল, কত খেলা
কী অপূর্ব সোনালী ধান ক্ষেতের
আলে আলে চরতো আমাদের
গরু-ভেড়া-ছাগল এমনি আরো কত
আমরা চরাতাম—ওরা ঘস্ ঘস্ করে
খেয়ে যেতো কচি কচি ঘাস—আর
ফাঁকে ফাঁকে কী অপূর্ব সুরে, দূরে-অদূরে
বাজতো ওদের গলায় টুন্‌টুনি
টুন্ টুন টুন্ টুন টুন্ টুন—
আহা, কী মধুরইনা লাগতো আমাদের!
তারপর গরু-ভেঁড়ার দল নিয়ে
কী আনন্দে চলে যেতাম
একেবারে সোজা কালিন্দীর জলে
সব ছেলে মিলে কী হৈ-হুল্লোর
মদনা, কেকু, ঘিষু রমজান সবাই
গরুর লেজ ধরে ধরে চলে যেতাম
দূরে—আরো দূরে—
আমি বলতাম, চল্ চল্ আরো গভীর জলে-
সহসা ওরা ভয়ে বলে উঠতো
হ্যাইদে দাদা. ওটা কি!
আমি বলতাম-- দূর বোকা ওটা 'শোঁষ'।
অথচ তোমরা বলবে—মিছক কল্পনা,

না না, তা কেন হবে, সিরাজ গেল
এল ইংরেজ। এও গেল, এল কংগ্রেস,
আমরা তখন হাঁফ ছাড়লাম
হয়তো মোটা ভাতেই কিছুদিন····
তারপর, কখন কোন্ ফাঁকে কেমন করে
কেটে গেল তিরিশটি বছর····
বছরের প্রতিটি পাতায় পাতায়
খুঁজে দেখলাম আমি নিজেকে
দেখলাম মদনা, ফেকু, ঘিমু-রমজান—
না, সহসা মদনারই মত ছেঁরা হাফ প্যান্ট পরা
একটি ছেলে এসে অশ্রুভরা চোখে বলল
"কাকে খুঁজছো, বাবাকে ?"
আমি অবাক হলাম !
তারপর, কত বন-জঙ্গল, কত নদ-নদী, খাল-বিল
তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমার চেনা-অচেনা পথ।
শেষে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঐ
ছোট্ট খেলার মাঠটাতে। যেখানে কত শত
পদচিহ্নের নীরব হাহাকার তোলপাড় করলো হৃদয়কে
আমি সোজাসুজি ছুটে পালালাম
আমাদের ঐ গ্রামের চৌমাথায়
যেখান দিয়ে ঐ সাদা ধবধবে ইংরেজটা
রোজ ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতো
মানে ওই হে, যাকে তোমরা 'সাহেব' বলতে !
ওরে বাপ কী দাপটইনা ছিল তার !
তোমরা ভুলে গ্যাছো না কি ?
এই তো সেদিনের কথা। কত রাজা এল
কত মন্ত্রী, কত নেতা····এই তো
সেদিন ভোটের মাঠেও খুঁজলাম
আমাদের সেই সাধের পথগুলো, যে পথ দিয়ে

আমাদের বুড়ো পণ্ডিত যাতায়াত করতেন
হাতে থাকতো ছড়ি, বলতেন—কি রে,
তোরা কি গরু-ভেঁড়ার দলে থেকে থেকে
ওদেরও অধম হলি ! পথ চিন, মানুষ হো !
আহা, কী দিনইনা ছিল তখন !
বিশুটাও বোধ হয় নেই !
আজো তার দোকানের কথা মনে পড়ে
দু'পয়সায় ঘুড়ি কিনতাম, লাটাই কিনতাম
ভারী মিষ্টি লোক ছিল বিশুদা ;
কী মজবুত সুতাইনা রাখতো, আর
রোজ রোজ চানাচুর তো চেয়েই নিতাম আমরা।
আহা, দাওয়ায় একটা টুলের ওপর বসে থাকতো বিশুদা
কতদিন কত গল্প করতো, আমি, মদনা
ফেকু ঘিনু, রমজান হাঁ করে তাঁকিয়ে থাকতাম
ওর মুখের দিকে—
ও বলতো, তোরা লেখা-পড়া শিখ্
ইংরেজ আমাদের লেখতে পড়তে দেয়নি,
ওদের অত্যাচারে আমাদের পোষা বেড়ালও
বের হতনা ঘর থেকে। বুঝলি,
ওরা আমাদের রক্ত দিয়ে রঙ তৈরী করতো,
ওই রঙে দড়ি রাঙাতো, ওই দড়িতে
আমাদের ঝুলাতো—আর বুঝলি !
মুখে একটা কালো কাপড় ঢাকা দিত
আমরা চীৎকার করতাম— ওরা আরো পাক ঘুরাতো
তারপর বুঝলি, তারপর····
যা, কি সব বলতো বিশুদা ছাই
মাথার মুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না তখন,
আমরা শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম

ওর মুখ।   ওর চোখে আসতো জল
ও মুছে নিত কাঁধের গামছা দিয়ে।
তাই যুগের ফাটলে ফাটলে আজো
মানুষের মধ্যেই মানুষকে খুঁজে বেড়াই,
বাল্য-কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে
আজো খুঁজে বেড়াই আমার
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া গ্রাম
গ্রামের বিশুদা, মদনা, ফেকু, ঘিষু, রমজান
সেই পুরনো সোনালী ধান ক্ষেত—সবুজ মাঠ
কালিন্দ্রীর জল, গরু-ভেঁড়ার দল
সেই সুখ—সেই স্মৃতি আর তারই মাঝে মাঝে
খুঁজি আজো বাঁচার চেনা-অচেনা পথ
অথচ তোমরা এখনো বলো
'যতসব কল্পনার ছবি'।
বেশ তো, যদি সেটাই তোমরা ভেবে থাকো,
থাক না, কে করে মানা।
বিদেশী চাবুক মেরেছে, না হয় তোমরাও দশ ঘা…
মুর্দার বুকের উপর না হয় আরো দশ টুকৃড়ি
এই তো!   দাও দাও মানা নেই—
শুধু তোমাদের কাছে এটুকুই আবেদন
কোথায় কোন বন-বাদাড়ে আমার ঐ
হতভাগা মদনা, ফেকু, ঘিষু, রমজান
কোন্ গরুর লেজ ধরে ধরে আজো ঘুরে বেড়াচ্ছে
ওদের সাথে দেখা হলেই বলো—
আমি আজো দাঁড়িয়ে আছি ওদের অপেক্ষায়
আমাদের সেই পুরনো গ্রামের, সেই চৌমাথায়—
যেখানে আজ অনেক অনেক ঘাস-কাঁটা-কলমি
গুল্ম রাজিতে ভর্ত্তি হয়ে গ্যাছে
বিষাক্ত আদিম-অরন্যের, বিষাক্ত আব-হাওয়ায়!!

তবু হেরি দূর

একদিন অবেলাতে বসে আছি নদী তটে
আঁখি পটে এঁকে যাই ছবি,
ওপারেতে ঝাউবন দোলা খায় কাশবন
নীরবেতে হেরে যাই সবই।
সুদূর আকাশ হেরি হিমালয় হিম-গিরি
কাঁপে যেন শুধু থরথর,
চকিতে চোখের 'পরে আকাশে পতাকা উড়ে
বাতাসেতে করি ফর ফর।
সহসা খানিক দূরে কেবা দাঁড়াইয়া ওরে
আঁখি দু'টি করি ছল ছল,
পরণে বত্রিশ জোড়া তালি দেওয়া শাড়ী সারা
কেঁদে যায় শুধু অবিরল !
হাতে-পায়ে একি হায় কেমনেতে সহে তায়
বত্রিশ শিকল আছে বাঁধা,
দেখিয়া নয়ন মোর হল আবেশেতে ভোর
নিমেষেই চোখে লাগে ধাঁধা !
মনের বাঁধন ছিঁড়ে কহিনু সোহাগ ভরে
কে গো তুমি কাঙালিনী বেশে !
কোথায় তোমার বাস কিবা হেরো কিবা আশ
দাঁড়াইলে কেন হেথা এসে ?
কহিলা করুণ সুরে চিনিলেনা তুই ওরে
পুত্রহারা আমি অভাগিনী,
সুদূর ভারত ভূমে পুত্র হেরি চির ঘুমে
শয়নে স্বপনে কাঙালিনী !
কহিনু বালিকাটিরে কোন্ পুত্র খুঁজো ফিরে
বল বল কোথা সে সন্তান !
কহিলা বালিকা মোরে শোন্ ওরে বলি তোরে
যেবা করে মুক্তির সন্ধান।

বত্রিশ বছর মোর বত্রিশ আশার ডোর
দিয়ে গেল শুধু মোরে ছল,
আজও শৃঙ্খল পরে কেঁদে ফিরি সকাতরে
করিল না কেহ মোর মুক্ত শৃঙ্খল !
এই তো অবেলা পটে বসে ভাবি নদী তটে
কোথা আছে কে বা কর্ণধার,
এপার ওপার শুনি ডেকে যায় প্রতিধ্বনি
কেবা আছো করে যাও পার !
বালিকা চলিয়া গেছে পদচিহ্ন রেখে গেছে
দিয়ে গেছে শৃংখলিত সুর—
আজও ভারত 'পরে তেরঙ্গা পতাকা উড়ে
তবু হেরি বহু দূর দূর !!

কর্ণধার

একদিন অনিশ্চয়তার অভীপ্সু লক্ষ্যে
তোমরাই তো নৈরাশ্যের নিভৃত কোণ হ'তে
চেয়েছিলে বিষণ্ণ ব্যাকুলতার হিমঘরে প্রত্যাশার সূর্য্য-কিরণ
চেয়েছিলে মনের মরসুমী আকাশে স্বচ্ছ-শুভ্র দেশ,
ক্রমশঃ ফ্যাকাশে ফুসফুস চেতনার গাঢ় রঙে
রঞ্জিত করেছিলো গোণে গোণে শ্বাপদদের মহর্লোক
সে কি ভুলে গ্যাছ যুবক !

সে কি ভুলে গ্যাছ যুবক
সেদিন কত মায়ের আঁচল প্লাবিত পাশবিক পরিবাহে
কত সুজাতার অকাল বৈধব্য—কত বিদেশীর করতলে
ইজ্জত সেজেছিলো যেন রাশি রাশি দানবের দক্ষিণা
মানবতার মর্ত্তালোক পেরিয়ে কোন মর্মন্তুদ মোহনায়—
ফলে কত দীক্ষিত দেশ প্রেমিক সময়ের মিতালিতে
মেতে উঠেছিলো মাভৈঃ মন্ত্রে—মার্গণ নয়,
ফাঁসির মঞ্চে হাসির গানে ভরেছিলো ভুবন
"সে তো মৃত্যু নয়— স্বাধীনতার শৌখিন বন্ধন"
সে কি ভুলে গ্যাছ যুবজন !

সে কি ভুলে গ্যাছ যুবজন
ঐ যে আজো তোমাদের প্রত্যাশার ভালে
বিদেশী নয়—স্বদেশী নেতৃত্ব চামড়ার অন্তরালে
লাগাম বিহীন শোষণের মুখোশে সেজেছে সজ্জন
তোমরাই তো এনেছো হারানো সূর্য্যের হারানো কিরণ,
কোথা মেঘ ? সে তো মেঘ নয়, ক্ষণিকের আচ্ছাদক
সে কি ভুলে গ্যাছ যুবক !

পাতা খুলো—উল্টাও সহস্র রজনীর····সহস্র প্রাচীর
ক্ষিপ্র বুননে কত অফিসে····অস্ত্রাগার····গুদামে
বুলি নয়—স্বাধীনতার গুলি, দিকে দিকে অলৌকিক আশ্বাস
বীর নেতাজী বিপ্লবী সুভাষের বৈপ্লবিক আদেশ—
তোমরাই তো এক একটি বিনয়-বাদল-দীনেশ
সে কি ভুলে গ্যাছ অভিনিবেশ !

বাস্তুর বাহনে ঘটিবে সমাবেশ—
তাই মহাজীবনের পঙ্কিল পরিধি পেরিয়ে
অগ্রণী হতে হবে শ্বাপদদের সম্মুখীন, ভিক্ষে নয়,
করুণা নয়, কেড়ে নিতে হবেই সকলের অবিচ্ছেদ্য অধিকার
তোমরাই তো জাতীয় জীবনের সকল অলঙ্কার
সে কি ভুলে গ্যাছ কর্ণধার !!

কিস্তিমাত

বাল্য-কৈশোর-যৌবনের
পুঞ্জীভূত ব্যথার বিষাক্ত ঢেউ পেরিয়ে
পড়েছে পাক দেহ-পিঞ্জরের স্নায়ুতন্ত্রে।
তন্ত্রে নয়—মন্ত্রে আমি দীক্ষিত
নজরুল-সুকান্তের পথে চলার চাল
বানিয়ে দিয়েছে আমায়
দাবার চৌষট্টি ঘরের অজেয় মন্ত্রী।
আমি জানি, বিশ্বের বুর্জোয়া দাবাড়ুদের
আমার সংযমী সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে
কিস্তি দিতে দিতে দিতেই
একদিন ওদের কিস্তিমাত করবোই
কোন এক কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের
কোন এক উল্লসিত মিছিলে।

এজলাসে দাঁড়িয়ে

তোমাদের এজলাসে এসেছি আমি
বুভুক্ষ জনতার ক্রন্দন শোনাতে নয়—
এসেছি, শুধু এটুকুই জেনে রেখো
বুভুক্ষ জনতার স্পন্দিত উত্থিত হুহুংকার
মারমুখি সংগ্রামে ওরা সোচ্চার
তোমরা প্রস্তুত— হুঁশিয়ার !
তোমাদের এজলাসে এসেছি আমি
পরাজিত সৈনিক স্বরূপে নয়—
এসেছি, শুধু এটুকুই লিখে রেখো
কোন এক ঘনঘটা কুয়াশার প্রত্যুষেই
ওরা গড়ে নেবে মহাবিশ্বের
মহা এক অলৌকিক ইতিহাস !
তোমরা শুধু জেনে রেখো
তোমাদের উল্লাস মুখর প্রাসাদ প্রকোষ্ঠ
ওদের হাতের ক্ষণিকের শিশু খেলাঘর,
ঐ শোন মহা কালবৈশাখীর পূর্বাভাস—
গুড়ু গুড়ু গম্ভীর—মৃত্তিকা চৌচির
কম্পিত হুহুংকার—ডমরুর জয়ডঙ্কা
হুঁশিয়ার ! তোমরা হুঁশিয়ার !
তোমাদের এজলাসে এসেছি আমি
বিনয়ের কোমল করজোড়ে নয় —
প্রলয়ের মহাজোটে, জোট বেঁধে বলে যাই
কোটি কোটি কঙ্কাল— ঐ নাচে মহাকাল
দিক দিগন্তে জ্বলেছে উত্তপ্ত শ্মশানী-মশাল—
তোমাদের এজলাসে শুধু দিয়ে গেলাম
মহাকাল মহা বৈশাখীর এক পূর্বাভাস
তোমরা শুধু এটুকুই জেনে রেখো !

সমাপ্ত